ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৪/নভেম্বর-২০০৭

শমসের গাজী (১৭০৬-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ): মধ্যযুগের এক কিংবদন্তী শাসক

*এ, কে, এম, আবদুল আউয়াল মজুমদার**

শমসের গাজী মধ্যযুগের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী শাসক। তাঁকে নিয়ে রচিত প্রায় চুয়ান্নটি গ্রন্থ/স্মরণিকা/পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি "শমসের গাজী" নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। "বাংলাপিডিয়া"র ৯ম খণ্ডের ২৫৭ সংখ্যক পৃষ্ঠায় তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ সংরক্ষণ করার জন্য কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ভারতে তাঁর উপর অনেক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. রমেন্দ্র বর্মণ "গাজীনামা" নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রন্থটির সকল কপি বিক্রি হয়ে যায়। ফলে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে হয়।

গাজীর বীরত্বগাথা, পুঁথি, কবিতা, প্রবচন, জারি-সারি গান এক সময় ফেনী, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। আজো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এগুলো প্রচলিত রয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে গাজীর পালা, গাজীর গীত ও গাজীর পুঁথি পাঠ ছিল অন্যতম প্রধান সংস্কৃতিচর্চা। ছোট শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য দাদা-দাদী, নানা-নানী তাদেরকে শুনাতেন গাজীর বীরত্বগাথা ও অবিশ্বাস্য কেচ্ছাকাহিনী। ভারতের ঘরে ঘরে এখনো শিশুদেরকে ঘুম পাড়ানোর জন্য গাজীর বীরত্বগাথা শুনানো হয়। অথচ এখন বাংলাদেশে আমরা এ বীর শাসক সম্পর্কে অতিসামান্যই জানি ও আলোচনা করি। তিনি আমাদের কাছে অনেকটাই বিস্মৃত। এমন একজন কিংবদন্তী শাসকের হারিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়।

শমসের গাজীর পরিচয়

প্রকৃত নাম শামসের আলী। শাসনকালে দরবারে প্রচলিত নাম শ্রী শ্রীযুত মাহাম্মদ শমসের চৌধুরী জমিদার। পিতার নাম পীরবক্স মোহাম্মদ। মাতার নাম কৈয়্যারা বিবি। জন্ম ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান- বর্তমান ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার দক্ষিণশিক পরগনার নিজকুঞ্জুরা গ্রাম। এ গ্রামটি ছাগলনাইয়া উপজেলার ঘোপাল

---

*রেক্টর, বিপিএটিসি এবং শমসের গাজী বিষয়ক গবেষক। প্রকাশিত গ্রন্থ 'শেকড় লতাপাতা ও ঠিকানা'

ইউনিয়ন-এর অন্তর্গত। আদি পৈত্রিকনিবাস নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার ওমরাবাদ পরগনার কচুয়া গ্রাম। শমসের গাজীর পিতা পীরবক্স মোহাম্মদ ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে কচুয়া থেকে নিজকুঞ্জুরায় আগমন করেন।

পীরবক্স মোহাম্মদ-এর পরিবার ওমরাবাদের তালুকদার ছিলেন। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ তাণ্ডব এবং নানাবিধ কারণে পীরবক্স মোহাম্মদ ধন-সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় তিনি ওমরাবাদ থেকে নিজকুঞ্জুরায় পাড়ি জমান। এখানে তিনি বাজার সরকারের চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি জমিদার নাছির মোহাম্মদ-এর একজন কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। জনশ্রুতি রয়েছে যে, পরবর্তীকালে পীরবক্স মোহাম্মদ-এর নামেই বর্তমান পরশুরাম উপজেলার একটি বাজারের নাম হয় "পীরবক্স মুন্সীর হাট"। তালুকদারি-জমিদারির কর্মাধ্যক্ষদেরকে "মুন্সি" নামেও ডাকা হতো। পীরবক্স মোহাম্মদ একজন শিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন।

শমসের গাজীর জন্মের অল্প কয়েক বছর পরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতঃপর তিনি নিঃসন্তান হিন্দু তালুকদার জগন্নাথ সেন ও তদীয় স্ত্রী সোনা দেবীর পালকপুত্র হিসেবে লালিত-পালিত হন। শিশুকাল থেকেই শমসের গাজী ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তাঁর মেধাশক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি ছিলেন স্কুলের সেরা ছাত্র। একই স্কুলে জমিদার নাছির মোহাম্মদ চৌধুরীর পুত্ররাও অধ্যয়ন করত। কিন্তু তাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে শমসের গাজীর সঙ্গে পেরে উঠত না। শমসের-এর মেধাশক্তি সম্পর্কে কৈলাসচন্দ্র সিংহ উল্লেখ করেছেন, "অল্পকালেই শমসের বিদ্যাবলে ও বাহুবলে জমিদার পুত্রগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইলেন।"[১] বাল্যকালেই তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ঐ বয়সেই তিনি গড়গড় করে বলতে পারতেন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, সুর দিয়ে গাইতে পারতেন ফারসি কবি রুমী, খৈয়াম ও হাফিজের শের।

শুধুমাত্র বিদ্যা-বুদ্ধিতেই নয়, তিনি দুরন্তপনা, সাহসিকতা ও শারীরিক শক্তিতেও ছিলেন বলীয়ান। বাল্যকালেই অস্ত্রচালনায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। কুস্তি খেলায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর বহু বীরত্বপূর্ণ ও অবিশ্বাস্য দুরন্তপনা লোকজনের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। তিনি তালুকদার জগন্নাথ সেন-এর কাছে তালুকদারি পরিচালনার তালিমও গ্রহণ করেন। শমসের-এর পালক পিতা জগন্নাথ সেন-এর মৃত্যুর পর তিনি কঙ্গুরার (শুভপুর) তালুকদার হন। ১৭৩৯ থেকে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কঙ্গুরার তালুকদার ছিলেন। এ তালুকদারির কাছারি ছিল চম্পকনগরে। ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণশিক-এর জমিদারি গ্রহণ করেন। ১৭৪৫

[১] "রাজমালা" লেখক–শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণশিক-এর জমিদার ছিলেন। মেধা, সাহস, শক্তি, ন্যায়বিচার ও বীরত্বের কারণে তিনি প্রচণ্ড প্রতাপশালী জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

শমসের-এর স্বপ্ন ছিল বাংলার ভাটি অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর অসীম সাহস, শারীরিক শক্তি এবং ন্যায়পরায়ণতার কারণে সাধারণ জনগণ তাঁকে পছন্দ করতেন। তারা শমসের-এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। শমসের জনতার সহায়তা নিয়ে এক বিরাট লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনীর সহায়তায় তিনি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনসাধারণ্যে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। বিপ্লবী জমিদার হিসেবে চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দেন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার বিশাল অংশ তাঁর শাসনাধীনে আসে। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বৃহত্তর নোয়াখালী, কুমিল্লা, ত্রিপুরার অধিকাংশ অঞ্চল, সিলেটের কিয়দংশ এবং উত্তর চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত এলাকার এক মহাপ্রতাপশালী শাসক ছিলেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, মুর্শিদাবাদের নবাব মীর কাসেম আলী এবং ত্রিপুরার মহারাজাদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজয়ের মাধ্যমে তাঁর শাসন এবং একইসঙ্গে জীবনাবসান ঘটে।

শমসের গাজীর পরাজিত ও নিহত হওয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি হন। অতঃপর প্রথমে তাঁকে ঢাকায় এবং পরে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিশেষে বর্তমান দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটে এনে তোপের মুখে তাঁকে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য, ঘোড়াঘাটে তখন মুর্শিদাবাদের নবাবদের একটি দুর্গ ছিল। অপর একদল ঐতিহাসিকের মতে, একজন সাধুর মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের নবাব কৌশলে তাঁকে নবাবের প্রাসাদে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তাঁকে স্বীয় প্রাসাদ থেকে বন্দি করে নিয়ে ঘোড়াঘাটে হত্যা করা হয়। তাঁর রাজধানী ও প্রাসাদ ছিল বর্তমান ছাগলনাইয়া উপজেলার জগন্নাথ-সোনাপুর গ্রামে। তাঁর পরাজয়ের পর প্রতিপক্ষরা তোপ দিয়ে তাঁর প্রাসাদ ও রাজধানী নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। সেখানে বর্তমানে একটি কেল্লার প্রবেশমুখের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এলাকাটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।

গাজীর রাজত্বকালে জগন্নাথ-সোনাপুরে স্থাপিত রাজধানী ও বিশাল প্রাসাদ সম্পর্কে "গাজীনামা"য় উল্লেখ রয়েছে যে:

"দক্ষিণেতে ফেনী নন্দি, পূর্বে গিরি
মুড়াবন্দি উত্তরেত এহেন জলদি।।

পশ্চিমে ময়লা পানি তার মধ্যে ভদ্রাখানি, মধ্যে যেন খিরুদের দধি।।"

প্রতিপক্ষরা গাজীর প্রাসাদ ও রাজধানী উড়িয়ে দিলেও সেখানে তাঁর শাসন আমলের কিছু স্মৃতিচিহ্ন আজও রয়ে গেছে। আজ থেকে প্রায় ২৬০ বছর আগে ছাগলনাইয়া, পরশুরাম ও ফুলগাজী এলাকায় গাজীর খননকৃত কৈয়্যারা দিঘী, তনু বিবির দিঘী, আটাই দিঘী, বল্লভপুরের আলীয়া গাজীর দিঘী, পূর্ব ছাগলনাইয়ার দেওয়ান আবদুর রাজ্জাকের দিঘী, দেওয়ান বাটির দিঘী, মনু বিবির দিঘী, জগন্নাথ মন্দির ও মূর্তি, কাটাগঙ্গা ও মরাগঙ্গা এবং ত্রিপুরার তৎকালীন রাজধানী উদয়পুরে এখনও গাজীর দরগা তাঁর শাসন আমলের কীর্তি বহন করে চলেছে। ফেনীর আদিনাম শমসেরনগর। অনুমান করা হয় এটিও শমসের গাজীর নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ইতিহাসে শমসের গাজী

'গাজী' শব্দের অর্থ বিজয়ী বীরযোদ্ধা। যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বপ্রদর্শন ও জয়লাভের কারণে জনসাধারণ তাঁর নামের সঙ্গে "গাজী" শব্দটি জুড়ে দেন। জনগণের নিকট তাঁর বড় পরিচয় ছিল গাজী। তিনি ছিলেন প্রজাসাধারণের নিকট কিংবদন্তীর মতো।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক শমসের গাজীর শৌর্য-বীর্য ও গৌরবময় কীর্তি তুলে ধরতে গিয়ে তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁর কতিপয় উপাধি হচ্ছে- ভাটির বাঘ, বীরকেশরী, অলৌকিক শক্তির অধিকারী, বীর সিপাহসালার, বিপ্লবী জমিদার, মুকুটহীন রাজা, প্রজারঞ্জক শাসক, প্রজাবান্ধব শাসক, জনহিতৈষী শাসক, দানবীর, গরিবের রাজা, সাহসী ও সুনিপুণ যোদ্ধা, শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী শাসক, বিস্ময়কর শক্তি প্রদর্শনকারী শাসক ও সেনানায়ক ও দামি নবাব ইত্যাদি।

গাজী সম্পর্কে কয়েকজন ইতিহাসবিদ, গবেষক ও লেখকের উক্তি নিচে তুলে ধরা হলো:

১. "কুমিল্লা জেলার ইতিহাস" (১৯৮৪) গ্রন্থের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস/মধ্যযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশে লেখক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া[২] উল্লেখ করেন (পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯):

   "শমসের গাজী নামক এক ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। চাকলা রওশনাবাদসহ এক বিরাট এলাকা তাঁর শাসনাধীন ছিল। তিনি একজন দক্ষ, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ভূম্যধিকারী ছিলেন।"

[২] প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর (১৯৬৮), অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (১৯৭৬) গবেষক, শিশুসাহিত্যিক, অনুবাদক, সমালোচক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক।

২. ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ "রাজমালা" গ্রন্থে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬):
"শমসের গাজী প্রকৃতপক্ষে দাতা ছিলেন।"

৩. ত্রিপুরার বুদ্ধিজীবী ও লেখক বাবু ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী বলেন:
"বিস্ময়কর শক্তি প্রদর্শনের পর এইরূপ একটি বিস্ময়কর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল।"

৪. অমলেন্দু দে[৩] সম্পাদিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "রাজমালা" বা ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থের ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এক সময়ে শমসের গাজী নামে এক ব্যক্তি ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থান দখল করে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। একখণ্ড হাতে লেখা "জীবন চরিত্র" কৈলাস চন্দ্র সংগ্রহ করে ব্যবহার করেন।"

৫. "নোয়াখালী জেলার ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক কাজী মোজাম্মেল হক[৪] লিখেছেন:

"তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, সাহসী ও সুনিপুণ যোদ্ধা এবং বীরকেশরী। সমকালীন রাজন্যবর্গ তাঁর বীরবাহুর নিকট সদর্পে টিকতে পারেন নি। শমসের গাজীর প্রতিভা এবং অপরিমেয় শক্তি ও সাহস মারাঠা বীর শিবাজী অথবা শের শাহের বীরত্বের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তিনি ছিলেন ভাটির বাঘ- এক বিশাল ভূ-খণ্ডের অধিপতি।"

৬. ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত "গাজীনামা"-র সম্পাদক ড. রমেন্দ্র বর্মণ লেখক ও গবেষক বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে:

"শমসের গাজীর কৃষক আন্দোলন ও গেরিলা রণকৌশল আবহমানকালের প্রাকৃতজনের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের রণকৌশল। মাও-সে-তুঙ, চে গুয়েভারা, মারিঘেলা অথবা অন্য কেউ এই রণকৌশল উদ্ভাবন করেন নি। তারা শুধুমাত্র কৌশলকে উন্নত ও ফলপ্রদ করেছেন।" এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি শমসের গাজীকে মাও-সে-তুঙ ও চে গুয়েভারার কাতারভুক্ত করেছেন।

৭. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন:

"শমসের গাজী ভাটি বাঙ্গালার দামি নবাব হইয়াছিলেন। তাহার চমকপ্রদ ইতিহাস রবিনহুডের গল্পের মত চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক।"

---

[৩] ভারতীয় ইতিহাসের গুরুনানক অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক।

[৪] অবসরপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা। বর্তমানে ফেনী শহরে বসবাসরত।

৮. দীনেশচন্দ্র সেন তার "The Folk Literature of Bengal" গ্রন্থে গাজীকে একজন ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি গাজীর নামের আগে বার বার 'দি' বসিয়ে গাজীকে "দি শমসের গাজী" নামে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি গাজীর বীরত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

৯. শমসের গাজীর বংশধর আলহাজ্ব সফর আলী[৫] এর (১৮৯২-১৯৬৯) বর্ণনায়:
"শমসের গাজী ছিলেন এক মহাশক্তিশালী যোদ্ধা ও শাসক। শত্রুবাহিনী তাঁর নিকট বার বার পরাজিত হয়েছে। কোনভাবেই টিকতে না পেরে অবশেষে জাদু করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যায়। অতঃপর হত্যা করে। শত্রুরা তাঁর বংশধরদের ওপর চালায় অশেষ নির্যাতন। জীবন বাঁচাতে বংশধরেরা নানা অজানা স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ও দুরবস্থায় পড়ে।"

গাজীর শাসনাধীন এলাকাগুলো ছিল:

১।	খণ্ডল (ফেনী)	১১।	পার্টিকরা (কুমিল্লা)
২।	জগৎপুর (ফেনী)	১২।	বলদাখাল (কুমিল্লা)
৩।	দক্ষিণশিক (ফেনী)	১৩।	কদবা (কুমিল্লা)
৪।	আরামরাবাদ (ফেনী)	১৪।	নূরনগর (কুমিল্লা)
৫।	তিষ্ণা (চৌদ্দগ্রাম)	১৫।	গঙ্গামণ্ডল (কুমিল্লা)
৬।	চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা)	১৬।	বিশ্যলগড় (সিলেট)
৭।	খাণ্ডানগর (কুমিল্লা)	১৭।	আটজঙ্গল (সিলেট)
৮।	মেহেরকুল (কুমিল্লা)	১৮।	ভাটিদেশ ও শ্রীহট্ট
৯।	বগাসাইর (কুমিল্লা)	১৯।	সরাইল (কুমিল্লা)
১০।	জামিরখানি	২০।	বরদাঘাত

গাজীর শাসনব্যবস্থা

গাজীর শাসন ও কীর্তিকলাপ সম্পর্কে শেখ মনোহর রচিত "গাজীনামা" এবং ত্রিপুরার "রাজমালা", "কৃষ্ণমালা", "চম্পক বিজয়" প্রভৃতি গন্থে উল্লেখ রয়েছে। গাজীনামা পুঁথি আকারে একটি হস্তলিখিত গ্রন্থ। পরবর্তীকালে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালীর সেরেস্তাদার মৌলভী লুৎফুল খবীর এটি মুদ্রিত করেন। গ্রন্থটি কলের ছাপায় কোলকাতা থেকে মুদ্রণ করা হয়। এর কপি বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। এর সর্বশেষ কপি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ "তিন হাজার বছরের নোয়াখালী" গ্রন্থের লেখক কাজী মোজাম্মেল হক চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার মঘধরা গ্রামের জনৈক

---

[৫] একজন ন্যায়পরায়ণ, বিদগ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ। নিবাস-বাসগুা (রায়কোট ইউনিয়ন), লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

আব্দুল বাতেন-এর নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। অনুরোধক্রমে বৃদ্ধ আব্দুল বাতেন জীর্ণ-শীর্ণ কপিটি কাজী মোজাম্মেল হককে দান করেন। এ কপিটি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাজী মোজাম্মেল হক-এর হেফাজতে ছিল। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা শহরের জনৈক অ্যাডভোকেট এ গ্রন্থটি ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ধার নেন। কিন্তু পরে আর ফেরৎ দেননি। ফলে মৌলভী লুৎফুল খবীরের গ্রন্থটিও এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে হস্তলিখিত মূল গাজীনামার উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরার গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. রমেন্দ্র বর্মণ একটি গাজীনামা সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থটি আগরতলার বিভিন্ন বুক স্টলে পাওয়া যায়।

কবি শেখ মনোহর রচিত মূল "গাজীনামা"য় মোট ৪,০০০ চরণ বা শ্লোক ছিল। এটি নবাব শমসের গাজীর মূল জীবনীগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি বেশ চিত্তাকর্ষক এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ। "গাজীনামা" সম্পর্কে এক প্রাচীন কবি লিখেছেন:

"শেখ মনোহর কহে পঞ্চগলি সরস।
গাজীর নামা পুস্তক হেন মধুরস।"

ড. রমেন্দ্র বর্মণ লিখেছেন: "গাজীনামা" এক অপূর্ব কাব্য, এক ঐতিহাসিক দলিল। শমসের গাজীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার শ্রমস্বেদজীবী কৃষকদের উত্থান ও জাগরণকে আমীর নন্দন শেখ মনোহর কাহিনী কাব্যে রূপায়িত করেন, যা কাব্য গুণে না হোক, বিষয় মহিমায় একথা নিশ্চিত, শমসের গাজীর কথা অপূর্ব।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গাজীর শাসনব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত, দক্ষ ও ন্যায়বিচারভিত্তিক। তিনি নতুন এক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর শাসন এলাকাকে পরগনা, থানা ও তহসিল-এ তিনভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর বহরে প্রায় পনের হাজার সৈন্য ছিল। তিনি প্রতি তহশিলে একশ জন সিপাহি এবং দু'জন মুহুরি নিযুক্ত করেন। বিচারব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সর্বোপরি তিনি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রজাসাধারণকে সুবিচার দেওয়া নিশ্চিত করেন। তিনি ৮২ সিক্কা ওজনে সের ধার্য করে নতুন বাজারব্যবস্থা চালু করেন। প্রতিবাজারে বাজার দর তালিকা লটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। কঠোরভাবে এ তালিকা অনুসরণে সকলকে বাধ্য করেন। কেউ অন্যথা করলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন।

"গাজীনামা"র ভাষায়:

"হাট বাজারে গাজি মনাদি ফেরাই।
উজন করিয়া দিল নিরেক লিখাই।।
হাটে বাজারে জথ বিরাসি ওজন।
তার পাচ্ছে কহি সুন নিরেক পতন।

সেক চালি পণপণ ধান্য কাঠারাম পীতা।
মরিছ ছএ কুড়ি গোড় দুই পণ ব্রতা।।
লবনের সের নেএ পণপণ বিক্রি করা।
রসুন পেয়াজ দিগ বনে গন্ডাধরা।।
কাপাসের মূল্য মাত্র পরিপণ ধার।
কলই ছএ কুমড়মাত্র মসুর দোগন পার।।
বাটলা মটল কেলই মূল্য বরাবর।
মুগ আর অড়লের পরিপণ সার।।
তৈল মুসের বারপণ ঘৃত চারিআনা।
গাজি এ করিয়া দিলা এইসব কার্খানা।।
মধুমূল্য দুই আনা তিল তিসি য়ানা য়ানা।
সৈশ্ব কেরন তিন পণ কাছ রাম দানা।।
এহা হোতে বেধকস করিতে না পারে।
অসুদ্দ না চলে কেহ গাজির যে ডরে।।"

শমসের গাজীর শাসন আমলের (১৭৪৫-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) কয়েকটি পণ্যের মূল্য:

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য
১.	চাউল	প্রতি সের	এক পয়সা
২.	লংকা	"	"
৩.	গুড়	"	দু' পয়সা
৪.	লবণ	"	"
৫.	পেঁয়াজ-রসুন	"	"
৬.	ডাল	"	"
৭.	মুগ ডাল	"	"
৮.	ঘৃত	"	চার আনা
৯.	সরিষার তেল	"	তিন আনা
১০.	মটর	"	দু' পয়সা
১১.	অড়হর	"	এক আনা
১২.	কার্পাস তুলা	"	এক পয়সা

অসাম্প্রদায়িক শমসের গাজী

শমসের গাজী ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ ও শাসক। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করতেন। হিন্দু-মুসলিম প্রভেদ তাঁর কাছে ছিল না। তিনি অনেক হিন্দুকে রাজকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শাসনকার্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে

হরিহর দেওয়ান, গঙ্গা গোবিন্দ, কানুরাম লস্কর, হরিশচন্দ্র প্রমুখ হিন্দুগণ নিয়োজিত ছিলেন। গঙ্গা গোবিন্দ ছিলেন তাঁর "প্রধান দেওয়ান" এবং হরিহর ছিলেন "নায়েব দেওয়ান"। তাঁর চতুর্থ স্ত্রী হিন্দুপরিবারের কন্যা ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দুকে নিষ্কর জমি দান করেছিলেন।

সুশাসক ও ন্যায়পরায়ণ গাজী

গাজী ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসক। তাঁর শাসনামলে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদেনি। তিনি প্রজাকুলের মঙ্গলসাধনে অতিশয় যত্নবান ছিলেন। তাঁর শাসনের মৌলিক নীতি ছিল "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন"। তিনি অত্যাচারী ব্যক্তিদেরকে কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি অসহায়ের পাশে দাঁড়াতেন। তাঁর শাসন এলাকায় পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল। তাঁর শাসন আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়। এপ্রসঙ্গে "গাজীনামা"র বর্ণনাঃ

"হক বিচার করে গাজী বেহক ভেজিয়া।
গাজীকে বাখানে সবে জগত ভরিয়া।।
ভাগ্যকর্তা শমসের গাজী মানে সর্বজনে।
পানির কুম্ভির বনের ব্যাঘ্রে সবে দোহাই মানে।"

গাজীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে "গাজীনামা"য় আরও উল্লেখ রয়েছে যে:

"হেনমতে করে গাজী মুল্যু করে কাম।
সদেষে বিদেষে ঘোষে গাজীর খোষ নাম।।
ডাকাইত পাইল তাকে তুলিদেন্দ খ্রিস্টাব্দে
চোর পাইলে হস্ত কাট ও তৎকালে।।
পরদারা হবে যেবা মারে বেত বারি।
জেন মজা তেন সাজা গাজী করে ভারি।।"

শিক্ষানুরাগী শমসের গাজী

তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী শাসক। তিনি তাঁর প্রাসাদে স্কুল খোলেন এবং ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করার সুযোগ করে দেন। সন্দ্বীপের এক অন্ধ হাফেজ সে মক্তবে ছেলে-মেয়েদেরকে আরবি শিক্ষা দিতেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তিনি হিন্দুস্তানের দেওবন্দ হতে একজন মৌলভি এনেছিলেন। বাংলা ভাষা ও ফারসি শিক্ষা দেওয়ার জন্য গুগিদিয়ার একজন গুরুমহাশয় ও ঢাকার একজন মুন্সি নিযুক্ত করেছিলেন। সকাল ৬টা হতে ১০টা এবং মধ্যাহ্ন ১২টা হতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্যন্ত শিক্ষাপ্রদানের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

বিদ্যোৎসাহী শমসের গাজী সম্পর্কে "গাজীনামা"য় উল্লেখ রয়েছে:

"তবে গাজি ভান্ডার খানা কৈলা এক বাড়ি।
পাকসালা দেয়ানখানা তোষাখানা ভারি।।
ভান্ডার খানা অধিকার আবুজে ভান্ডারি।
চন্দ্রমুদি তার সঙ্গে খরচ বদ্দারি।।
সতেক তোলোয়া খানা জাগির করিয়া।
গাজি পালে সে সবেরে অন্যবস্ত্র দিয়া।।
সুন্দিবির অন্দ হাফেজ য়ানিয়া।
কোরাণ পড়া এ পটুকান নিয়া।।
হিন্দুস্তানে হোতে এক মৌলবি আনিল।
আরবি এলাম তোলয়াগণ সিখাইল।।
জুগি দিয়া হোতে এক গুরচ্ছা ...।
লিখখেরে লিখায়ন্ত বাঙ্গলার বানি।।
ঢাকা হতে মনসি আনি পরে পড়াএ।
হেন মতে নিতি সাস্ত্র এলাম শখাএ।।
দিন মৈদ্দে নিউম করিল হনমতে।
দষ দষ দন্ড ধরি দোভালে পড়িতে।।
গাজির হুকুম হোতে নহে বেগ কম।
সময় ভূজন ইতি নিয়ম তামাম।।"

গাজীর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ড. রমেন্দ্র বর্মণ[৬] বলেন, "প্রায় সোয়া দু'শ/আড়াই'শ বছর আগে ধর্মবিযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার কথা শমসের গাজীর পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব না হলেও তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা যে যথেষ্ট উদার ছিল, তা আমাদের স্বীকার করতে হবে নির্দ্বিধায়। বিশেষত, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তো আশ্চর্য রকমের আধুনিক। প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকরি করার জন্য শমসের একে শুধু অবৈতনিক করে ক্ষান্ত হননি, শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সরকারি ব্যবস্থা আজও আমাদের বিস্মিত করে।"

প্রজারঞ্জক গাজী

কোনো কোনো ঐতিহাসিক শমসের গাজীকে "বিপ্লবী জমিদার" হিসেবে অভিহিত

[৬] ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ/৩১ ভাদ্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ তারিখে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, সুলেখক ও গবেষক ছিলেন। ১৭ আগস্ট, ২০০৩/৩১ শ্রাবণ ১৪১০ বঙ্গাব্দ তারিখে আগরতলার ঠাকুর পল্লী সড়কের নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

করেছেন। গাজী কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করেন। সাধারণ কৃষক ও প্রজাকুলের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর শাসনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতায় আরোহণ করেই তিনি প্রজাদের সার্বিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রজাদেরকে নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। "গাজীনামা"র ভাষায়:

"তুমি সবে দেয় জদি খরচ রসদ।
সব্বদিন থাক জদি মোহর মদদ।।
সর্ব্বে অঙ্গিকার আর কৈলাজে তোমার।
ধনে প্রাণে তোমারে পুজিনু বারেবারে।।
জেগতি আমার হএ সে গতি তোমার।
কোন মন্দ না করিয় মনেতে তোমার।।"

ফসলহানি ও দুর্ভিক্ষের কারণে প্রজারা কষ্টে পড়লে গাজী খাজনা মওকুফ করে দিতেন। তিনি অত্যাচারী জোতদার-তালুকদারদেরকে শাস্তি দিতেন। তাদের সম্পদ গরীব প্রজাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন দুর্বলের বন্ধু ও অত্যাচারী সবলের শত্রু।

অভিজাত শমসের গাজী

শমসের গাজী ছিলেন এক অভিজাত ব্যক্তি। মুর্শিদাবাদে নবাব আলিবর্দি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিস খাঁর বংশধর ও প্রতিনিধি ঢাকার নায়েব নাজিম হোসাইন উদ্দিন খাঁ ছিলেন শমসের গাজীর কন্যা মনু বিবির জামাতা। তাঁর আরেক কন্যা তনু বিবির জামাতা ছিলেন চট্টগ্রামের নিজামপুরের সামন্ত শাহজাদা জাকের মোহাম্মদ-এর পুত্র মোহাম্মদ ঠাকুর। শমসের গাজীর তৃতীয় স্ত্রীও ছিলেন নিজামপুরের দানিয়াল মোহাম্মদের কন্যা।

গাজীর আভিজাত্য, সুশাসন, ন্যায়বিচার, উদারতা, দানশীলতা, সুউচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে "গাজীনামা"য় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে:

চলিতে গম্ভীর জ্ঞানে রাজা অনুমান।।
বচন অমিয়াভাষ কণ্ঠে সুধাপান।
বসন ভূসন গাত্র দির্ব্ব দিপ্তিমান।।
মিত্র আগে মিত্রাধিক সুত্রয়াগে জম।
দানে দাতা অতিসত্র কর্মেত বিক্রম।।
ইস্তাছেত মহামন্ত্র নহেত বেষ কম।
নরমে নরম অতি গরমে গরম।"

গাজীর জনহিতকর কাজ এবং স্মৃতিচিহ্ন সম্পর্কে আগে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে গাজীর নির্মিত একটি ঐতিহাসিক কীর্তি 'মুতিঘরের' (মুক্তাগারের) বর্ণনা "গাজীনামা"র ভাষায় তুলে ধরা হলো:

"এক তোলা ঘর সোভা। মুনিগণ মোনলোভা।।
জেহেন অমরাপুরি। সভানের মোনহারি।।
দেখীতে নিয়া ছন্দা। জেন সত চন্দ্র বান্দা।।
ঝলকে তারকাগণ। চারি পাশে অভরণ।।
সেই সে ঘরের ঝরা। গুতি তমুতির ছরা।।
হেহেন চামর দোলে। সুবর্ণ সুতির জলে।।
বিন্দু বিন্দু বারি মোহে। গ্রীষ্ম উষ্ম নাহি রহে।।
... আনন্দ সানন্দ মন। হেন শ্রীবৃন্দাবন।।
রাধিকার কোরে কানু। যেন বৈসে যোগভানু।।"

উপসংহারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, বীর-মহাবীরেরা কখনও ইতিহাস থেকে হারিয়ে যান না; যেতে পারেন না। বরং সময়ের বিবর্তনে তাঁদের অমর গাথা ও মহান কীর্তিগুলো আরও উজ্জ্বল হয়।

শমসের গাজীও চিরকাল এদেশের মানুষের হৃদয়ে চিরভাস্মর হয়ে থাকবেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। গাজীনামা, লেখক: শেখ মনোহর।

২। গাজীর পুঁথি, লেখক: মৌলভী লুৎফুল খবীর।

৩। রাজমালা, এটি ত্রিপুরার মহারাজাদের ইতিহাস গ্রন্থ। লেখক: কৈলাশচন্দ্র সিংহ। প্রথম সংস্করণ প্রকাশ-১৮৯৬ (শমসের গাজীর মৃত্যুর ১৩৬ বছর পর), দ্বিতীয় সংস্করণ ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৭, প্রকাশক শুভ্রব্রত দেব, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কৃষ্ণনগর প্রধান সড়ক, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত।

৪। চট্টগ্রামের ইতিহাস, লেখক: মাহবুবুল আলম।

৫। চট্টগ্রামের ইতিহাস, লেখক: হামিদুল্লাহ খাঁ।

৬। কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, প্রকাশকাল ১৯৮৪। প্রকাশক: কুমিল্লা জেলা পরিষদ।

৭। তিন হাজার বছরের নোয়াখালী পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, লেখক: কাজী মোজাম্মেল হক, প্রকাশকাল: ১৯৮২। প্রকাশক: মমতাজ মহল বেগম, হিরামন প্রকাশনালয়, ৬৩ বনানী আবাসিক এলাকা, ফেনী।

৮। শমসের গাজী, লেখক: মেসবাহুল হক।

৯। হীরকডানা, লেখক: স্বকৃত নোমান।

১০। বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, প্রকাশক: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল: মার্চ ২০০৩। খণ্ড-৯।

১১। "গাজীনামা", সংকলন ও সম্পাদনা: ড. রমেন্দ্র বর্মণ, প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ১৯৯৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০১, প্রকাশক: শুভ্রব্রত দেব, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কৃষ্ণনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত।

১২। "ফেনীর ইতিহাস", লেখক: জমির আহমেদ, প্রথম প্রকাশ: ২৬ মার্চ, ১৯৯০। প্রকাশক: সমতট প্রকাশনী, ৩২, কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

১৩। "ইতিহাসের রূপরেখায় ফেনী", লেখক: কাজী মোজাম্মেল হক, প্রকাশকাল: ১লা আগস্ট, ১৯৭৭।

১৪। "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়", লেখক: দীনেশচন্দ্র সেন।

১৫। "বাঙ্গালা সাহিত্যের কতিপয় ঐতিহাসিক কাব্য (প্রবন্ধ)", লেখক: দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

১৬। The Folk Literature of Bengali Dinesh Chandra Sen.

১৭। History of Bengali Language and Literature, Dinesh Chandra Sen.

১৮. "বৃহত্তর চট্টলা", লেখক: নূরুল হক।

১৯। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ কয়েকটি চ্যানেলে শমসের গাজীর উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন।

২০। শমসের গাজী। লেখক: আহমদ মমতাজ। প্রকাশক, বাংলা একাডেমি। প্রথম প্রকাশ: জুন ২০১৩।